দৈনিক বাংলা
তারিখ ... 19 MAR 1995 ... পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

সার্টিফিকেটের এই মোহ—

সরকার শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দিয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর সুযোগের সম্প্রসারণ ঘটছে। শিক্ষাকে উন্নয়নের প্রধান অবলম্বন গণ্য করে এ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। নিম্ন এবং গ্রাম পর্যায়ে খাদ্য সাহায্য এবং শিক্ষাসামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ে বৃত্তির সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এ উদ্যোগে কোথাও কোন ভুল নেই। সামাজিক উন্নতি ছাড়া আর্থিক উন্নয়ন অসম্ভব। দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নের প্রথম শর্ত। শিক্ষাই ব্যক্তিত্বের তথা দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারে। যে জনসংখ্যাকে আজ আমরা দুর্বহ বোঝা গণ্য করছি, শিক্ষার কল্যাণে তা জনশক্তিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ নিয়ে তাই বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। এ উদ্যোগ এরই মাঝে কিছু ফলও দেখাতে শুরু করেছে। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মধ্যপথে বিদ্যালয় ত্যাগের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া শিক্ষার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহবৃদ্ধির সাক্ষ্যই বহন করে। দেশে সাক্ষরের হারও এরই মাঝে আশাপ্রদভাবে বাড়তে শুরু করেছে।

বর্ণিত এ চিত্রকে উৎসাহজনক মানতেই হবে। আমাদের শিক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে তবু সন্তুষ্ট বা উৎসাহ বোধ করতে কোথায় যেন আটকে যায়। শিক্ষা ব্যবস্থার এ দুর্বলতার মূলে আছে দুর্নীতির বিস্তার। শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ এবং মহৎ একটি বিষয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন দুর্নীতি জাঁকিয়ে বসে আছে। পরিমাণগত অগ্রগতি এর ফলে মানের নির্ভরতা জন্মাতে দিচ্ছে না।

গোটা দেশে শিক্ষাকে কেন্দ্র করে যে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে তাতে শিক্ষার্থী আর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ারই কথা। এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে গেলে আমরা কিন্তু ব্যাপারটিকে স্বাভাবিভাবে নিতে পারি না। তদন্তদল গঠন করে বিষয়টি তলিয়ে দেখতে হয়। আর এর ফলে অস্বাভাবিকতার অভিযোগই সত্য বলে প্রতিষ্ঠা পায়। একটি মাত্র বোর্ড থেকে পাঁচ হাজারের মত পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে হয়।

রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে হয় এ জন্য যে এই বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর কেউই রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার যোগ্য নয়। দুর্নীতির মাধ্যমে তাদের পরীক্ষার্থী সাজানো হয়েছে মাত্র। এ দুর্নীতিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী, অভিভাবক, বিদ্যালয় ও তার শিক্ষকদের অন্তত একটি অংশ এবং বোর্ড বা তার কর্মচারীকর্মকর্তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ অবশ্যই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। জড়িতদের সংযোগ খুঁটিয়ে দেখলে আর অনেক অনেককে সম্পৃক্ত দেখা যাবে। দুর্নীতির বিস্তার কত ব্যাপক বোঝার জন্য এই একটি উদাহরণই পর্যাপ্ত বিবেচিত হওয়া উচিত।

যখন বলি, শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ তখন আমরা শারীরিক ও মানসিক পরিপূর্ণ বিকাশের কথাই বলি। কেবল কতিপয় ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন আর বৃদ্ধিতেই শিক্ষার লক্ষ্য পূর্ণ হয় না। মানসিক বিকাশের প্রধান দিক হচ্ছে ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় এবং মন্দকে পরিহার করে ভালকে গ্রহণ করার প্রস্তুতি। সোজা কথায়, নৈতিকতা আর শ্রেয় বোধ বাদ দিয়ে শিক্ষা সম্পন্ন হতে পারে না।

শিক্ষা কার্যক্রমের সব কিছুই যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, শিক্ষা সমাপনী সনদ যদি অনধিকারীর হস্তগত হয়, তাতে কেবল শিক্ষার লক্ষ্যই ব্যর্থ হয় না—একই সঙ্গে অশিক্ষার চেয়ে ক্ষতিকর কুশিক্ষা প্রবল হয়। আমাদের শিক্ষা পরিস্থিতিতে বিরাজমান বৈপরীত্য নিয়ে আক্ষেপ আর অতৃপ্তির কারণ এতেই নিহিত।

এসএসসির ভুয়া পরীক্ষার্থীদের উল্লিখিত নজিরটি একটু বিশ্লেষণ করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে পারে। এমন বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী চোরাপথে পরীক্ষায় অংশ নিতে উৎসাহিত হয়ে ওঠার কারণটা কি? কারণ স্পষ্ট। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ব্যাংক পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেয়ার এটাই শেষ বছর। প্রচলিত ধারণা এবং তা বহুলাংশে সত্যও বটে, যে কেউ নির্ধারিত পাঁচশ প্রশ্ন নাড়াচাড়া করে পরীক্ষায় বসে টিক চিহ্ন দিতে থাকলে পাশের নম্বর উঠে যাবে। যার অর্থ হচ্ছে, অতি সহজে একটি নির্ধারিত মানের (এসএসসি) পরীক্ষা সাফল্যের সনদ হাতে এসে যাওয়া। শিক্ষার্থী আর অভিভাবকের তাই উৎসাহের সীমা নেই। আর এ উৎসাহে মদদ জুগিয়ে মুফতে কিছু কামিয়ে নেয়ায় অন্যেরাও উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন।

এভাবে সনদ অর্জন সম্ভব হলেও তার পরিণতি সব দিক থেকেই মারাত্মক হতে বাধ্য। সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের যে সম্ভাবনা ছিল তা তো রুদ্ধ হলই, একই সঙ্গে পরিণত হল দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিতে। শিক্ষা সনদের তাৎপর্য হচ্ছে এই, তা একটি নির্ধারিত মানের দক্ষতা নির্দেশ করে। অনধিকারী কারচুপির মাধ্যমে সনদ হস্তগত করতে পারলেও দক্ষতার ধারেকাছে পৌঁছাতে পারে না। পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে কিংবা ব্যবহারিক জীবনে তাই এ সনদ কোন অর্থই বহন করে না। আর এই অবকাশে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাই তার নির্ভর বা বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়।

সর্বনাশা এ কাজটি কেমনভাবে সাধিত হয়েছে তারও কিছু কিছু খবর এখন পাওয়া যাচ্ছে। যেমন পঞ্চগড়ের দুটি বিদ্যালয়েই মোট একশ চুরাশিজন তথাকথিত ছাত্রকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়েছে। বিদ্যালয় দুটি মাত্র গত বছর স্বীকৃতি পেয়েছে। এ বছর বিদ্যালয় দুটিতে নবম শ্রেণী চালু হওয়ার কথা। বিদ্যালয়গুলোতে যেখানে দশম শ্রেণীই থাকার কথা নয়, সেখানে তারা পরীক্ষার্থী হাজির করেছে। আর তাও অবিশ্বাস্য রকমের উচ্চ সংখ্যা।

এই দুটি বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে একুশ এবং বারজন। সাধারণভাবে দশম শ্রেণী থাকলেও তাতে নবম শ্রেণীর চেয়ে কম শিক্ষার্থী থাকার কথা। এখানে কিন্তু তা অনেক বেশী। হয়ত বিদ্যালয়ের নিয়মিত মোট শিক্ষার্থীরই সমান। যেমন একটি একশ এক এবং অপরটি তিরাশি জন পরীক্ষার্থী হাজির করেছে। সংশ্লিষ্ট বোর্ড তা অনুমোদনও করেছে।

শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মিলিত চেষ্টায়ও এমনটা সম্ভব হওয়ার কথা নয়। কেননা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের যাবতীয় তথ্যই বোর্ডের কাছে মওজুদ থাকার কথা। একটি বিদ্যালয়ে কত শিক্ষার্থী থাকলে কতজন পরীক্ষার্থী হতে পারে এই সাধারণ সূত্রটি প্রয়োগ করলেই কারচুপির কথা পরিষ্কার হয়ে যায়। তার উপর যেখানে দশম শ্রেণীই চালু হওয়ার সময় আসেনি সেখানে বিদ্যালয় বদলের মাধ্যমে দশম শ্রেণী চালু হয়ে গেলেও তেমন শিক্ষার্থী কজন হতে পারে, এ প্রশ্নই অস্বাভাবিকতা স্পষ্ট করতে পারতো। কেউ তেমন কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। করার কথা নয়, যা করার জেনে বুঝেই করা হয়েছে। অপরাধটিকে তাই পরিকল্পিত এবং সুসংগঠিত বলা যায় অনায়াসে।

শিক্ষার অঙ্গন যদি এভাবে অপরাধের আঁখড়ায় পরিণতি পায় শিক্ষার আয়োজনেরই কোন অর্থ থাকে না। বিশ্বাসযোগ্যতা হারালে আমাদের কোন সনদেরই কোন দাম থাকবে না। এ পাপের প্রতিকারে উদ্যোগী হওয়া, তদন্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনিয়মিত রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা, সব বিবেচনাতেই তাই স্বাগত। আমরা একে স্বাগত জানাই।

এরপরও কিন্তু আমরা নিশ্চিত বোধ করতে পারি না। উৎকণ্ঠা সমানভাবেই জেগে থাকে। এ জন্য যে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তথা রেজিস্ট্রেশন বাতিলে সকল প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় না।

প্রথমই যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয়—এই অনাচার একটি মাত্র বোর্ডেই সংঘটিত হয়েছে, এমন নিশ্চয়তার ভিত্তি কোথায়? একই সামাজিক অবস্থানে, একই পদ্ধতির আওতায় অন্য তিনটি বোর্ডেও একই ধরনের অন্যায় সংঘটিত হতে পারে। যদি না হয়ে থাকে, অবশ্যই তা আনন্দজনক। তবে তলিয়ে দেখার পরই কেবল আনন্দিত হওয়া যায়।

পরের প্রশ্নটি আরো গুরুতর। এক যাত্রায় পৃথকফল বা এক পাপের ভিন্ন বিচার কোন কাজের কথা হতে পারে না। এ পর্যন্ত গৃহীত ব্যবস্থায় আমরা কেবল রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে ভুয়া পরীক্ষার্থীদের শাস্তি দেয়ার কথাই জানতে পারছি। আর চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এ তেমন কোন শাস্তিও না। পরীক্ষা দেয়ার কিংবা রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার অধিকার তাদের এমনিতেই ছিল না। ফোকটে কাজ সারতে চেয়েছিল। হয়নি। চুকেবুকে গেছে। গোটা শিক্ষার আয়োজনকে প্রহসনে পরিণত করার চেষ্টার ব্যাপারে কি করা হলো?

এই চেষ্টার সঙ্গে জড়িত অন্য সকল পক্ষ, বিশেষ করে গোটা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত বোর্ডের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে? এমন সুস্পষ্ট অনাচারেরও যদি যোগ্য প্রতিকার না করা হয় দুর্নীতিই উৎসাহিত, বলা উচিত পুরস্কৃত হবে। শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগকে সফল করতে হলে এ বিষয়গুলো ভুললে চলবে না।

শিক্ষা সমাপনী সনদ বা সার্টিফিকেট তখনই অর্থবহন করে যখন তা একটা নির্ধারিত মানের শিক্ষার নিশ্চয়তা বহন করে। অনাচারের চাপে আমাদের সনদ এ নিশ্চয়তা হারাতে বসেছে বলেই শিক্ষার আয়োজনও বিশ্বাস ধরে রাখতে পারছে না। একে দুর্দিনের আলামত বলেই নিতে হবে।

—সালেহ চৌধুরী